



178915 - আল্লাহর নাম ও গুণাবলির অর্থ ও ধরনের ব্যাপারে মুমনিরে অবস্থান

প্রশ্ন

এটা জ্ঞাত বিষয় যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াত মহান রব্বের গুণাবলি সাব্যস্ত করে; কোনোটো ধরন নরিধারণ (تكليف), প্রতিরূপ নরিধারণ (تمثيل), উপমা দান (تشبيه), ও অর্থব্যক্তিভুক্তকরণ (تعطيل) ছাড়া। তারা যখন গুণাবলি সাব্যস্ত করে, তখন ধরনকে ব্যাখ্যা করে, আর অর্থকে জানে। এক্ষেত্রে তারা ইমাম মালকের প্রসিদ্ধ বাণী দিয়ে দলীল পেশ করে: ‘আল্লাহর উর্ধ্বতন ওঠা জ্ঞাত, এর ধরন অজ্ঞাত’। আমার কাছে যে বিষয়টি প্রশ্নের উদ্রকে করেছে সেটি হলো আমরা যদি সকল গুণাবলির ক্ষেত্রে এমন কথা বলি তাহলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে: ‘তাহলে আল্লাহর হাসরি অর্থ কী’? অথবা ‘আল্লাহর চহোরার অর্থ কী’? অথবা ‘আল্লাহর দয়ার অর্থ কী’? অথবা ‘আল্লাহর পায়ের গোছার অর্থ কী’? এছাড়া আরও গুণাবলি। আমাদের জন্য কি এ গুণগুলোর আল্লাহর সাথে উপযোগী অর্থ জানা অনবির্ঘ্য হয়ে যায় না যাত করে আমরা তাফদিপন্থী (অর্থ সমর্পনবাদী) ব্যক্তিদিরে অন্তর্ভুক্ত না হই? সমস্যা হলো: আরবরা যখন অর্থকে ব্যাখ্যা করে তখন তারা যসেব সৃষ্টিজীবকে দেখে সে আলোকে ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে অবহতি করুন। আমি বিষয়টি নিয়ে দ্বিধায় আছি। কিছু বদিআতী আশারী এ নিয়ে আমাদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করেছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত আল্লাহর গুণাবলি ‘ধরন’ ব্যাখ্যা করে না; বরং এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করে। তারা মহান রব্বের গুণাবলির প্রতি ঈমান আনে, গুণগুলোর অর্থের প্রতিও ঈমান আনে এবং গুণগুলোর ‘ধরন’ আল্লাহ তাআলার নকিট অর্পণ করে।

ইবনুল মাজশীন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং অন্যান্য সালাফ বলছেন: “আল্লাহ নজি সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়েছেন এর ‘ধরন’ আমরা জানি না, যদিও আমরা এর ব্যাখ্যা ও অর্থ জানি।”[দারউ তাআরুদলি ‘আকলি ওয়ান্ন-নাকল (১/১১৫)]

আবু হাফস ইবনে শাহীন রাহিমাহুল্লাহুর পতি আবুত তায়যবি বলেন: “আমি আবু জাফর আত-তরিমযীর কাছে উপস্থিতি ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে রব্বের অবতরণ সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল: ‘এই অবতরণ কমন?’ ‘তাঁর উর্ধ্বতন কি তখনও থাকে?’ তিনি উত্তর দলিনে: ‘অবতরণ বোধগম্য, কনিতু এর ‘ধরন’ অজ্ঞাত; এর প্রতি ঈমান আনা ফরজ, আর এ



বসিয়ে প্রশ্ন করা বদিআত।”

যাহারী বলেন: “বাগদাদরে তৎকালীন ফকীহ ও আলমি সত্যই বলছেন। কারণ ‘অবতরণ কমন’ এ প্রশ্ন করা মূলতঃ অজ্ঞতা। সাধারণত প্রশ্ন করা হয় এমন কোনও শব্দ সম্পর্কে যা ভাষায় অপরচিতি। অথচ ‘অবতরণ’, ‘কথা বলা’, ‘শোনো’, ‘দেখো’, ‘জানা’ এবং ‘আরশে ওঠা’ এসব কথা শ্রোতার কাছে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। যখন এগুলো দিয়ে এমন এক সত্যকে গুণান্বিত করা হয় যার কোনও প্রতরূপ নাই তখন গুণও সত্যের অনুগামী। মানুষের কাছে গুণের ‘ধরন’ও অজানা।”[আল-উলু লিল-‘আলহিল গাফফার’ (পৃ. ২১৩-২১৪)]

আবু বকর আল-ইসমাঈলী বলেন: “তিনি আরশের উপর উঠছেন ‘কোনও ধরন নরিধারণ ছাড়া’; কারণ কেবল এটুকুই বলা হয়েছে যে তিনি আরশের উপর উঠছেন, কিন্তু কীভাবে উঠছেন তা উল্লেখ করা হয়নি।”[মা‘আরজিল কুবুল (১/১৯৮)]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো: তারা গুণাবলি সাব্যস্ত করে, গুণগুলোর প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করে ভাষাগতভাবে যে অর্থের জন্য সঠিক গঠিত এবং এর ধরন ও বাস্তব রূপের জ্ঞান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। পাশাপাশি তারা বিশ্বাস করে যে, এসব গুণাবলি সাব্যস্ত করা থেকে আল্লাহ বা তাঁর কোনও গুণকে সৃষ্টির সঙ্কেত তুলনা করা বোঝায় না। কারণ তিনি নিজ সত্যায়ও সদৃশহীন, তাঁর গুণাবলীতেও সদৃশহীন।

দুই:

প্রশ্নকারী ভাইয়ের বক্তব্য যে: “আমরা যদি সকল গুণাবলির ক্ষেত্রে এমন কথা বলি তাহলে আমাদেরকে জিজ্ঞাসে করা হতে পারে: ‘তাহলে আল্লাহর হাসরি অর্থ কী’? অথবা ‘আল্লাহর চহোরার অর্থ কী’?”

আমরা বলব: আল্লাহর হাসরি অর্থ হলো: আল্লাহ তাআলার জন্য হাসরি গুণ প্রকৃত অর্থই সাব্যস্ত করা, রূপক অর্থ নয়; এমনভাবে যা তাঁর সাথে উপযুক্ত, কোনও প্রতরূপ স্থাপন বা ধরন নরিধারণ ছাড়া। সুতরাং আমরা গুণকে সাব্যস্ত করব, আমরা অর্থকেও সাব্যস্ত করব। আর এর ধরনকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করব, যমেনটি আগতে বলা হয়েছে। এ কথা প্রত্যেকে গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শাইখ ইবনে জবিরীন রাহমাহুল্লাহ বলেন: “আমরা গুণ সাব্যস্ত করি এবং গুণ থেকে উপমা দানকে অস্বীকার করি। ‘উপমা দান’ কেবল সৃষ্টিকুলের সাথে নরিদৃষ্টি। আমরা বলি: আল্লাহ তাআলা নিজই তাঁর জন্য এ গুণ সাব্যস্ত করছেন, তাই আমরা তা সাব্যস্ত করি, কিন্তু, উপমায় অতশিয়ন করি না এবং এমন কিছু বলি না যা সত্য নয়। এ কথা সুবদিতি যে, সৃষ্টির গুণ তার উপযুক্ত; যমেন সৃষ্টির হাসি হলো জেরে শব্দ করা ও হা হা করে হাসা, যা কোনও আনন্দদায়ক বা খুশির কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু রব যভোবে চান সভোবেই হাসনে, এমন এক গুণের মাধ্যমে, যার ধরন আমরা জানি না।”[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে জবিরীন (৬৩/৯৬)]



তনি:

প্রশ্নকারীর বক্তব্য: “আমাদের জন্য কি এ গুণগুলোর আল্লাহর সাথে উপযোগী অর্থ জানা অনবিদ্য হয়ে যায় না যাত করে আমরা তাফবদিপন্থী (সমর্পনবাদী) ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না হই?”

প্রশ্ন নম্বর (138920)-এর উত্তরে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ‘তাফবদি’ (সমর্পন)-এর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, তাফবদি (সমর্পন) দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়:

প্রথম অর্থ: শব্দকে ও শব্দ থেকে জ্ঞাত অর্থকে সাব্যস্ত করা, এরপর এর ধরনের (কাইফিয়াহ) জ্ঞান আল্লাহর কাছে সমর্পন করা।

এই অর্থটি সঠিক এবং এটিই আহলুস সুন্নাহর মাযহাব।

দ্বিতীয় অর্থ: কেবল শব্দকে সাব্যস্ত করা, কিন্তু এর অর্থই না জানা। এটি বাতিল।

অতএব, অর্থ জানা ও গুণের বাস্তবতাকে সাব্যস্ত করা এবং গুণের ধরন জানা উভয়টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

স্থায়ী কমিটির আলমিরা বলেন: “আল্লাহ নজিরে জন্য যে গুণ সাব্যস্ত করছেন তথা দুই হাত, দুই পা, আঙুলসমূহ ইত্যাদি যা কুরআন ও সুন্নাহতে উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলো আল্লাহর জন্য উপযোগী পন্থায় সাব্যস্ত করা ওয়াজবি; কোনও বক্তাকিরণ (তাহরীফ), ধরন নরিধারণ (তাকরীফ), সাদৃশ্য স্থাপন (তামসীল) ও অর্থব্যতিক্রম (তা’ত্বীল) ছাড়া। গুণগুলো প্রকৃত অর্থবোধক; রূপক নয়।” [ফাতাওয়ালা-লাজনাহ আদ-দায়মিহ (২/৩৭৬)]

তাই আমাদের উচিত হলো, দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা: যে অর্থের ওপর ঈমান আনা ও তা সাব্যস্ত করা আবশ্যিক, আর যাই ধরন আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। কারণ আমাদের প্রভু আল্লাহ তাআলার কোনও প্রতরূপ নাই।

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“সালাফদের ঐকমত্য (ইজমা) বর্ণনা করছেন এমন একাধিক আলমিরে বক্তব্য রয়েছে (তাদের মধ্যে খাত্তাবীও আছেন) যে, সালাফদের মাযহাব হলো: এসব গুণকে তার প্রত্যক্ষ অর্থের উপরই বহাল রাখা, পাশাপাশি এর ‘ধরন নরিধারণ’ ও ‘সাদৃশ্য দান’-কে নাকচ করা। কারণ ‘গুণাবলি’ সম্পর্কে আলোচনা মূলত ‘সত্তা’ সম্পর্কে আলোচনারই শাখা, এতে ‘সত্তা’-র অনুসরণ ও অনুগমন করা হবে। সুতরাং যখন সত্তা সাব্যস্ত করা মানতে সত্তার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা; ‘ধরন’ নরিধারণ করা নয়, তখন গুণাবলি সাব্যস্ত করা মানতে গুণের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা; ধরন নরিধারণ করা নয়।

অতএব আমরা বলব: তাঁর হাত আছে, তাঁর শ্রবণশক্তি আছে; কিন্তু আমরা বলব না যে ‘হাত’-এর অর্থ ‘কুদরত’ এবং



‘শ্রবণ’-এর অর্থ ‘জ্ঞান’। ... এসব গুণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই গুণ, যা তাঁর মহিমার উপযোগীভাবে তাঁর পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত; যমেনভাবে প্রত্যকে বস্তুর গুণ তার সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সুতরাং জানা দরকার, ‘জ্ঞান’ হলো বিশেষেতিরে একটি সত্তাগত গুণ এবং এ গুণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; অনুরূপ কথা চহোরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য...।

অনুরূপ কথা তাঁর ‘কর্ম’-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা জানি যে ‘সৃষ্টি করা’ মানতে শূন্য থেকে অভিনিবভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনা। যদিও আমরা সেই কর্মের ধরন-প্রকৃতি নির্ধারণ করি না এবং তা আমাদের কর্মের মতোও নয়। কারণ আমরা কাজ করি প্রয়োজনের তাগিদে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। তাঁর ‘সত্তা’-ও অনুরূপ। তাঁর সত্তাকে সামগ্রিকভাবে জানা যায়, যদিও তাঁর সত্তা সৃষ্টিসমূহের সত্তার মত নয় এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ তিনি ছাড়া আর কউে জানে না এবং কউে তার ধরন উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁকে এসব গুণান্বিত করার মাধ্যমে এটাই ফুটে ওঠে এবং এ অর্থই শব্দগুলোর অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

মুমনি এসব গুণের বধি-বিধান ও প্রভাবসমূহ জানে। তার কাছ থেকে এটাই চাওয়া হয়েছে। মুমনি জানবে যে, আল্লাহ সব কছির ওপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ তাঁর জ্ঞানে সব কছিকে পরবিষ্টন করে আছেন, কয়ামতের দিনে সমগ্র পৃথিবী হবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী হবে তাঁর ডান হাতে প্যাঁচানো। মুমনিরা জান্নাতের তাদরে স্রষ্টির চহোরা দেখবে এবং এর দ্বারা এমন এক আনন্দ লাভ করবে, যার তুলনায় সব আনন্দ তুচ্ছ হয়ে যাবে ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে সে জানবে যে, তার একজন রব, স্রষ্টি ও উপাস্য আছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত রূপ সে জানে না। বরং সৃষ্টির জ্ঞানে চূড়ান্ত সীমা এটাই, তারা কোনও বস্তুকে কছির দিক থেকে জানে, কিন্তু তার পূর্ণ স্বরূপ পরবিষ্টন করতে পারে না। নজিদের সম্পর্কেও তাদরে জ্ঞান এই পরায়েরই।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৬/৩৫৫-৩৫৮)]

চার:

প্রশ্নকারীর বক্তব্য: “সমস্যা হলো: আরবরা যখন গুণগুলোর অর্থকে ব্যাখ্যা করে তখন তারা যসেব সৃষ্টিজীবকে দেখে সে আলোকে ব্যাখ্যা করে।”

আমরা বলব: আরবরা যখন সৃষ্টির গুণাবলির অর্থ ব্যাখ্যা করে, তখন তারা সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে যা তারা দেখে, জানে ও উপলব্ধি করে। কিন্তু, আল্লাহর গুণাবলির ধরন নিয়ে কীভাবে আলোচনা করা সম্ভব, যখন তৈরি এমন সত্তা যার মতো কছির নই, যাঁকে দৃষ্টিসমূহ আয়ত্ত করতে পারে না এবং যাঁকে তারা জ্ঞান দিয়ে পরবিষ্টন করতে পারে না?!

বদিআতীদরে সংশয় থেকে কারো পক্ষে নিরাপদ থাকা সম্ভবপর নয়; কেবল সালাফদের পথ অনুসরণ করা ছাড়া এবং তাদরে পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া।



আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।